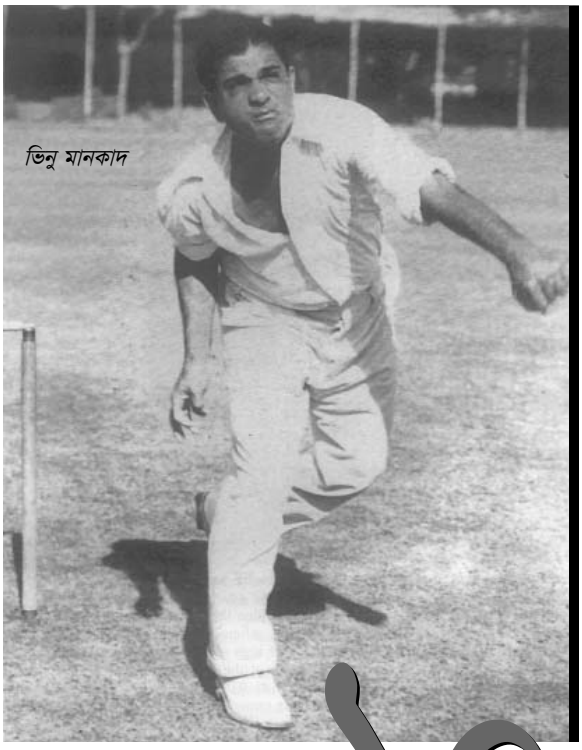

সেরা ১০ লড়াই

ভিনু মানকাদ

কারগিল থেকে ক্রিকেট। ভারত-পাকিস্তান মানেই যুদ্ধ। গত অর্ধশতাব্দী থেকে যুদ্ধের শেষ নেই যেন। দেশ ভাগের পর প্রথম ক্রিকেট সিরিজ ১৯৫২ থেকে ২০০5 পর্যন্ত অনেক লড়াই হয়েছে মাঠে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিরিজগুলো থেকে ইতিহাস বদলে দেয়া ১০টা অংশ নির্বাচন করেছে উইজডেন এশিয়া। ক্রিকেটীয় শত্রুতার চরম বহিঃপ্রকাশের ঘটনাগুলো...

লিখেছেন **হাসান জামান**

ভি নু' র ঘূ র্ণি

ভিনু মানকাদের ১৩ উইকেট, প্রথম টেস্ট, দিল্লি, ১৯৫২ : দু'দেশের মধ্যে খেলা প্রথম টেস্ট। ভিনু মানকাদ মায়াবী ঘূর্ণিতে বধ করলেন ১৩ ব্যাটসম্যান। প্রথম ইনিংসের ম্যারাথন ৪৭ ওভারে মাত্র ৫২ রান দিয়ে ৮ উইকেট তুলে নিলেন। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৩৭২ রানের জবাব দিতে নেমে বিনা উইকেটে ৬৪ থেকে ১২৯ রানে অলআউট। ফলাফল টেস্টে হার।

পলি উর্মিগর : আমার মতে ইতিহাসের অন্যতম সেরা বাঁহাতি স্পিনার ভিনু। যে কোনো উইকেটেই ভালো বল করতে সক্ষম। ফিরোজ শাহ কোটলার পারফর্মেন্সই এটা প্রমাণ করবে। প্রথম ইনিংসে ৪৭ ওভার ৫২ রানে ৮ উইকেট। পরিসংখ্যান বলছে পাকিস্তানিদের ওপর তার m¯úó আধিপত্যের কথা।

পেস খেলতে পারঙ্গম পাকিস্তানিরা নতুন বলে লালা অমরনাথ আর এস রামচাঁদের বলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলো। ভিনু আর গুলাম আহমেদ স্পিন আক্রমণে এলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ভারতের শক্ত উইকেটে ভিনু ক্লান্তিহীন বল করে যাচ্ছিলো একই লেন্থে ধারাবাহিকভাবে। ব্যাটসম্যানদের সামনে এনে ফ্লাইটে পরাস্ত করছিলো। সুনিপুণ চতুরতার সঙ্গে ফ্লাইট ব্যবহার করতো ভিনু। বুঝতো, কোন ব্যাটসম্যানকে কোথায় বল করতে হবে। সাধারণত অফ স্টিকে আক্রমণ করতো আর এলবিডব্লিউ পেতো দ্রুত ডেলিভারিগুলোতে। এক ম্যাচে ১৩ উইকেট তুলে নেবার জন্য যা দরকার সে ছিল তার চেয়েও ভালো। (ভারতের একমাত্র ইনিংসে উর্মিগর করেছিলেন ২৫ রান)

ফজল মাহমুদ : ভারতের ইতিহাসে যত অলরাউন্ডার এসেছে ভিনু তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কমনওয়েলথ দলের হয়ে এমসিসির বিপক্ষে তার সঙ্গে খেলেছিলাম সে বছরই। দিল্লি টেস্টে সে পাকিস্তানিদের ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বিনা উইকেটে ৬৪ রানে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। তারপরই সে প্রথম আঘাত হানে। পুরো ম্যাচেই তাকে খেলাটা ছিল অসম্ভব। শুধুমাত্র হানিফ মোহাম্মদ বাদে সবাইকে তার বিষাক্ত বোলিংয়ের বিরুদ্ধে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। নির্দোষ লাইন-লেন্থের সঙ্গে বল ঘুরিয়েছে। বুদ্ধিমানের মতো উইকেটকে ব্যবহার করেছে। মাঝে মধ্যেই বলের বাউন্স আমাদের বুক সমান উচ্চতায় আসছিলো। এছাড়াও লালা অমরনাথ তাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছিলো। অমরনাথ আমার দেখা ভারতের চতুর ক্যাপ্টেনদের অন্যতম। '৪৭-এর আগে সে লাহোরে ছিল এবং আমাদের কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে রঞ্জি ট্রফি ও জোনাল টুর্নামেন্টে খেলেছে। এই অভিজ্ঞতা সে মাঠে ব্যবহার করে। বোলারের জন্য আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সেট করে এবং ভিনু প্রথম থেকেই সেভাবে বল করে গেছে। আরেকটা ব্যাপার হলো, আমরা প্রথম টেস্ট খেলছিলাম। তাই চাপ সামলাতে না পেরে খুব দ্রুত ভেঙে পড়ি। এটা অবশ্যই ভিনুকে ছোট করার জন্য বলা নয়। সে ছিল দিল্লির সেরা খেলোয়াড়। (ফজল ২১ ও ২৭ রান, সঙ্গে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। তিনিই একমাত্র ভিনুর বলে আউট হননি।)

বি গ হি টিং

মিয়াদাদ বাহিনী ভারতকে হারালো। তৃতীয় টেস্ট, করাচি, ১৯৭৮ : এই টেস্টে সুনীল গাভাস্কার দু'ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন। তবুও তিনি ছিলেন পরাজিতের দলে। শেষ

R‡qi ci Bgivb-wgqv`v`

দিন, শেষ সেশন। পাকিস্তানিদের ২৫ ওভারে দরকার ১৬৪ রান। ইমরান খানের কিছু বিগ হিট আর অন্যদের সম্মিলিত চেষ্টা পাকিস্তানকে পৌঁছে দেয় জয়ের বন্দরে।

জহির আব্বাস : ম্যাচটির ভাগ্যে ড্র'ই লেখা ছিল। শেষ দিনে ভারত ব্যাট করছিলো। সুনীল গাভাস্কার ইনিংসে দ্বিতীয়বারের মত চমৎকার একটা সেঞ্চুরি করল। আমরা ব্যাটিংয়ে গেলাম টি ব্রেকের পর। যখন আমাদের দরকার ১৬৪ রান, ২৫ ওভারে। কাজটা কঠিন ছিলো, তবে লাহোরে দ্বিতীয় টেস্টে রান তাড়া করে জেতাটা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। পরিবেশটা এককথায় ছিল প্রচন্ড উত্তেজনাপূর্ণ। সময় বাড়ার সঙ্গে ভিড় বাড়ছিলো। যেটা ছিল খুব বিস্ময়কর। সবাই আমাদের জয় চেয়েছিলো।

আসিফ ইকবালকে ওপেনিংয়ে নামানো হয়। এটা ছিল ভালো একটা সিদ্ধান্ত। ওয়ান ডাউনে নেমেছিলেন জাভেদ মিয়াদাদ। প্রত্যেকটা রান উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছিলো। তারা দ্রুত সিঙ্গেলস বের করছিলো। ভারতীয়রা হতভম্ব হয়ে বুঝতে পারছিলো না কি করা উচিত। আমাদের ইনিংসে বাউন্ডারির আধিক্য ছিল না। ওয়ানডের মতো সিঙ্গেলস নিয়ে ম্যাচ বের হয়ে আসে।

তারপর আসিফ আউট হলো। ইমরান নেমে খুব সহজভাবে বিষেন সিং বেদীর এক ওভারে ২টা ছয় আর ১টা চার মেরে ম্যাচটা শেষ করে দিলো। এরকম কিছুর সঙ্গে থাকা সত্যিই চমৎকার। (জহির ১ম ইনিংসে ৪২ রান করেছিলেন)

কারসান ঘাবরী : আমরা খুব সহজেই টেস্টটা ড্র করতে পারতাম। কিন্তু বেদী উইকেট চাচ্ছিলো। বিশেষত, ফর্মে থাকা ইমরান খানের। আর ইমরান বোলারদের তুলোধুনো করছিলো। কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো না আমাদের কত ওভার বল করতে হবে। সময়টাই ছিল মূল ব্যাপার। আমরা পেস আক্রমণ চালিয়ে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, আমাদের ক্যাপ্টেন বেদী তা চাইছিলো না।

পাকিস্তানিদের শুরু দেখে মনে হয়নি তারা জেতার জন্য খেলছে। যখন রান আসা শুরু করল, হাতেও পর্যাপ্ত উইকেট, ইমরান আর মিয়াদাদ মেরে খেলা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত বেদী ইমরানের উইকেট পেতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু পাকিস্তানিরা এই সুবিধা নিয়ে জয়ী হলো। (ঘাবরী ম্যাচে ৪২ ও ৩৫ রান এবং ২ উইকেট নিয়েছিলেন)

সুইংয়ের ভেল্কিবাজি

ইমরানের ধ্বংসযজ্ঞ, দ্বিতীয় টেস্ট, করাচি, ১৯৮২ : ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। টপঅর্ডার ইমরান একাই গুঁড়িয়ে দেন মাত্র ২৫ বলের এক স্পেলে, মাত্র ৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে। সেদিন ইমরান মোট ৮ উইকেট পেয়েছিলো ৬০ রানে। ভারত ম্যাচ হারে ইনিংস ও ৮৬ রানে।

Mvf¯ªi : Bgiv‡bi Av‡iKwU wkKvi

ওয়াসিম বারী : আমার মনে পড়ে, এটা ছিল সত্যিকারের দ্রুত আর আগ্রাসী বোলিং। ইমরানের ইনসুইংগারগুলো ছিল অসামান্য। ওয়াসিম আকরাম ও ওয়াকার ইউনুস থেকে আলাদা । তুলনা করলে ইমরানের বল অনেক বেশি রিভার্স সুইং করছিলো যা

শেষ বলে ছয়

জাভেদ মিয়াদাদের ম্যাচ জয়। অস্ট্রেলেশিয়া কাপ, শারজাহ, ১৯৮৬ : এটা এরকম একটা মুহূর্ত, যা দু'দেশের দর্শকরাই সারা জীবন মনে করবে যখনই ওয়ানডে খেলবে দল দুটো। অস্ট্রেলেশিয়া কাপের শেষ বল। পাকিস্তানের দরকার ৪ রান। বল বাকি ১টা। এবং মিয়াদাদ চেতন শর্মাকে উড়িয়ে মাঠের বাইরে বল পাঠালেন। পাকিস্তানের অবিশ্বাস্য এক ম্যাচ জয়!

জাভেদ মিয়াদাদ : ভারতীয়রা এক সঙ্গে হয়ে তাদের কৌশল ঠিক করে নিচ্ছিলো। পুরো খেলাটা শেষ এক বলে এসে থেমেছে। চার রান দরকার জিততে। আমিও আমার নিজস্ব কৌশল ঠিক করলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম শর্মা আমার পায়ে ইয়র্কার দেবে। তাই ব্যাটিং ক্রিজ থেকে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়ালাম। আমার কৌশল ছিলো যতটুকু সম্ভব জায়গা করে নেওয়া এবং সর্বশক্তি দিয়ে পেটানো।

আমি তখন ১১৩ বলে ১১০ রানে নটআউট। বলও খুব ভালো দেখছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো বল ব্যাটে আসলে বাউন্ডারিতে পাঠাতে পারব। পুরো ফিল্ড সেট দেখে নিয়ে প্রস্তুত হলাম।

চেতন শর্মার হাত থেকে বলটা ছুটে গিয়েছিলো। অথবা ক্রিজ থেকে সামনে দাঁড়ানোতে সে লেন্থ বুঝতে ভুল করে। বলটা ছিলো চমৎকার একটা ফুলটস। আমার এবং পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে প্রার্থিত বল। আমি সেটাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলাম।

তারপর আনন্দের আতিশয্যে ঠিক কি করেছি, নিজেও জানি না। এটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত (মিয়াদাদ ম্যাচে ১১৬ রান করেন ১১৪ বলে)।

চন্দ্রকান্ত পন্ডিত : আমার মনে আছে সবাই একসঙ্গে আলোচনা করছিলাম শেষ ওভারটা কে করবে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো চেতনের দ্রুত গতি ও সুইং ব্যাটসম্যানের রান দিতে অসুবিধায় ফেলবে। পুরো ওভারটা ছিল ঘটনাবহুল। মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন সহজ একটা রানআউট মিস করেন। অন্যদিকে রজার বিনি চমৎকার ফিল্ডিং করেন। এখনও আমার মনে পড়ে শেষ বলটায় জাভেদ কিভাবে উপরে তাকিয়ে প্রার্থনা করেছিলো।

চেতনের ইয়র্কার করার কথা ছিলো। সেটি হয়ে গেলো ফুলটস। জাভেদ বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিলো। সবাই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম মুহূর্তটিতে। (পন্ডিত ম্যাচে উইকেটকিপিং করেছিলেন)

একেবারেই তার নিজস্ব। সেই স্পেলে উইকেটকিপিং করা সত্যিই কঠিন ছিলো। কারণ বল প্রচুর সুইং করছিলো।

বারোদার মহারাজা (ভারতের টিম ম্যানেজার) আমাকে বলেছিলো, 'আমাদের ব্যাটিং লাইনআপ ১১ নম্বর পর্যন্ত। কোনোকিছুই এই লাইনআপকে অলআউট করতে পারবে না'। জবাবে আমি বলেছিলাম, 'তোমরা এখনও ইমরানকে দেখনি। তোমাদের ১৫ জন থাকলেও সে তাদের আউট করবে।

(পাকিস্তানের হয়ে ম্যাচে উইকেট কিপিং করেছিলেন)

অরুণলাল : রান করার জন্য চমৎকার ধীরগতির উইকেট ছিলো সেটা। কিন্তু ইমরান অস্বাভাবিক বোলিং করে আমাদের টপ অর্ডার মুছে ফেলল। উইকেটের আড়াআড়ি বাতাস বইছিলো। বলের সাইন নষ্ট হলেই ইমরান ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করলো। দু'দিকেই দুর্দান্ত সুইংয়ের কাছে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম।

ইমরান পরিচিত ছিলো তার দ্রুত ও বুক সমান উচ্চতায় করা খাটো লেন্থের বলের জন্য। সুইংয়ের চেয়ে আক্রমণাত্মক বলের জন্য। কিন্তু সেদিন নতুন বলে দুদিকেই সুইং আর পুরনো বলে রিভার্স সুইং পাচ্ছিলো। এই ক্ষমতার কথা আমরা জানতামই না। এটা ছিল একটা গোপন অস্ত্রের মতো। নিজেদের রক্ষার উপায় আমাদের জানা ছিলো না। (অরুণলাল ৩৫ ও ১১ রান করেছিলেন)

এ কা ই এ ক শো

সেলিম মালিক একাই জেতালেন দ্বিতীয় ওয়ানডে, কলকাতা, ১৯৮৭: কোলকাতায় ভারত মুক্তির নিঃশ্বাস

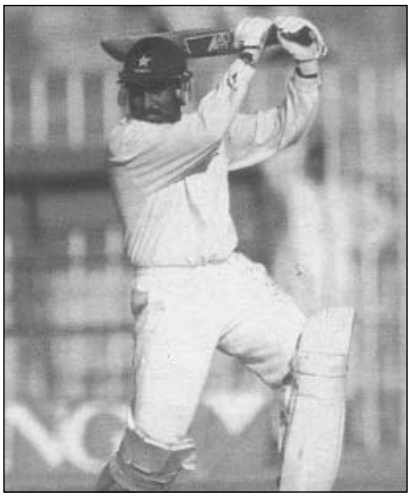

tgvnbxq gwjK

ফেলছিলো যখন মিয়াদাদ দ্রুত আউট হয়ে যায়। পাকিস্তানের আরেকটি রান তাড়া করার ঘটনা এটি। হঠাৎই দৃশ্যপটে হাজির সেলিম মালিক। মাত্র ৩৬ বলে ৭২ রান করে টেলএন্ডারদের সঙ্গে নিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যান।

চন্দ্রকান্ত পন্ডিত : মালিক যখন ব্যাটিংয়ে নামে তখন ম্যাচের ৮ ওভার বাকি। ওভার প্রতি আট রান দরকার। দ্রুতই হারালেন ইমরানকে। আর কেউ ছিল না তাকে সঙ্গ দেবার জন্য।

মনিন্দর সিং-এর অনেক ওভার বাকি। তিনি মিডল-লেগে বল করে যাচ্ছিলেন রান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। মালিক সুইপ করা শুরু করলেন। বেশ কিছু রান পেলেন এভাবে।

রবি শাস্ত্রী ও লালচাঁদ রাজপুতের বলগুলো খেলছিলেন অনায়াস দক্ষতায়। ফাঁক বের করে সিঙ্গেলস আর মূলত স্কয়ার লেগ ও মিডউইকেট দিয়ে বাউন্ডারি পাচ্ছিলেন। এমনকি ওভারের শেষ বলে সিঙ্গেলস নিয়ে স্ট্রাইকও নিচ্ছিলেন।

ভারত সবসময়ই এগিয়ে ছিল। কিন্তু মালিক আমাদের অজান্তেই ম্যাচটা বের করে নিয়ে যায়।

রমিজ রাজা : যখন মালিক ক্রিজে আসে, আমাদের স্কোর ৫ উইকেটে ১৬১, আমরা সত্যিই ভাবিনি আমাদের জেতার সুযোগ আছে। তখনও প্রায় ৮০ রান দরকার। কোন ব্যাটসম্যানও নেই। তখনকার দিনে ওভারপ্রতি ৮ রান করে নেওয়া ছিল অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার।

cwK¯vb `‡ji উল্লাস

কপিল দেবের ওভারে ৫টা চার মেরেই সে আমাদের ম্যাচে নিয়ে আসে। ৫টাসহ সে ধারাবাহিকভাবে ৭টা চার মারে।

ভারতের বাউন্ডারিগুলো ঠেকানোর দরকার ছিল। কিন্তু সেদিন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল মালিকের হাতে। সে একাই ম্যাচ বের করে আনে।

শে ষ ভ র সা

শচীন আউট, ভারত আউট। প্রথম টেস্ট, চেন্নাই, ১৯৯৯ : শেষ দিনের শেষ সেশন। ভারত ২৫৪ , ৬ উইকেটে। জিততে মাত্র ১৭ রান দরকার। টেন্ডুলকার তখনও ক্রিজে।

ক্রি কে ট দ স্যু

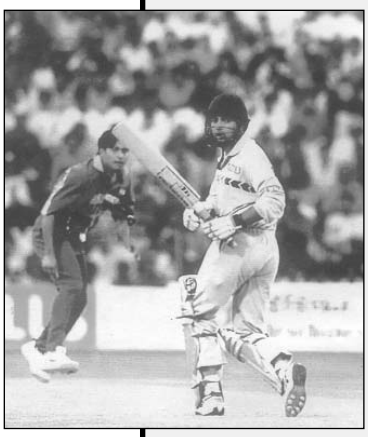

জাদেজার ১ ওভারে করা ২২ রান, বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনাল, ব্যাঙ্গালোর, ১৯৯৬ : অজয় জাদেজা ওয়াকারের দুই ওভারে ১৮ ও ২২ রান নিয়ে ম্যাচটাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়। ভারত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৮৭ রান করে। শেষ পর্যন্ত জাদেজার ঝড়ো গতিতে করা রানগুলোই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়। পাকিস্তান জবাবে ২৪৮ রান করতে সক্ষম হয়।

অজয় জাদেজা : আমার কাজ ছিল ঝড়ো গতিতে রান তোলা। সবকিছুই সেদিন পরিকল্পনা মতো হচ্ছিলো। আমি ব্যাটিংয়ে যাই তখন ম্যাচের ৮ ওভার বাকি। স্লগ ওভারে পাকিস্তানি পেসারদের বিরুদ্ধে রান করা সব সময়ই কঠিন। ৪৮তম ওভারে এলো ওয়াকার। তার প্রথম বলটাই কাভার দিয়ে চার মারলাম। তখন থেকেই যা করতে চেয়েছি, সবকিছুই ঠিকমতো হয়েছে।

রশিদ লতিফ : জাদেজার ইনিংস আমার দেখা ওয়ানডের অন্যতম সেরা। প্রচন্ড চাপে থাকা অবস্থায় ওরকম খেলা সত্যি কঠিন। জাদেজা যখন নামে তখন ভারতের রান ৪ উইকেটে ২০০। আমি ভেবেছিলাম তারা বড়জোর ২৪০-২৫০ রান করতে পারবে। জাদেজাই সমীকরণটা পাল্টে দেয়।

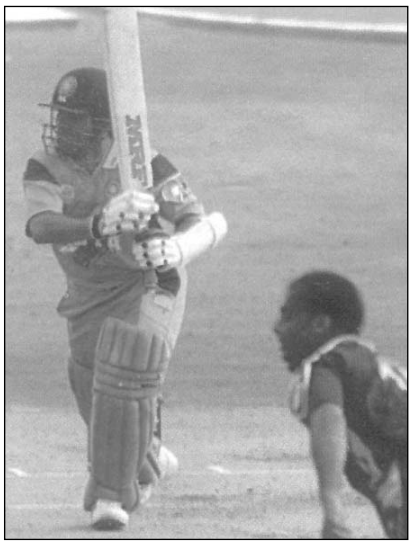

†UÛjKvi : Avevi we‡ùviY

লফটেড ড্রাইভ খেলতে গেলেন। মিসটাইমিং করে আউট। আর মাত্র ৪ রান নিতে পেরেছিলো তারা। ১২ রানে ম্যাচ হেরে গেলো।

মঈন খান : আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম শচীন ম্যাচটা বের করে নিয়ে যাবে। সে এতই চমৎকার ফর্মে ছিলো।

দ্বি গু ণ বি প দ

শোয়েবের ২ বলে ২ উইকেট। এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, কোলকাতা, ১৯৯৯: শোয়েব আখতার কোলকাতা টেস্টের পুরো ঘটনাপ্রবাহ পাল্টে দেয়। রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন টেন্ডুলকারকে পরপর লেট সুইঙ্গিং ইয়র্কার ডেলিভারিতে আউট করে সে।

মঈন খান : তাদের ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রায় কিছুই করতে পারিনি। তাদের রান ছিলো ২ উইকেটে ১৫০। তারপর একটা পানি পান বিরতির ঠিক পর শোয়েবের আশ্চর্য ইয়র্কার দ্রাবিড়ের স্ট্যাম্প উড়িয়ে নিয়ে গেলো। পরের বলটাতে শচীনের মিডল স্ট্যাম্প নেই।

ডেলিভারি দুটো এখনও আমার খুব ভালো মনে আছে। তুলনায় গেলে দ্বিতীয়টা আমার মতে বেশি ভালো। দুটো ডেলিভারিই ছিল দ্রুত। তবে মূল কাজটা করেছে সুইং, লেট সুইং। (মঈন খান প্রথম ইনিংসে ৭০ রান করেন। সঙ্গে ৪টা ক্যাচ ও ১টা রান আউট করেন)

রাহুল দ্রাবিড় : পানি পান বিরতির পর শোয়েব খুবই বিষাক্ত বোলিং করছিলো। বিরতির ঠিক পরের বলটাতেই আউট হয়ে যাই। ড্রেসিংরুমে ফিরে আসতে পারিনি ঠিক মতো, দেখলাম শচীনও বোল্ড হয়ে ফিরে আসছে।

৬, ০, ৪, ৬, ৬, ৬

টেন্ডুলকারের কাদির বধকাব্য। প্রদর্শনী ম্যাচ, পেশোয়ার ১৯৮৯ : অফিসিয়াল ওয়ানডে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয় আলো না থাকার কারণে। বদলে ২০ ওভারের একটা প্রদর্শনী ম্যাচ হয়। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ১৫৭ রান করে। তারপরই ১৬ বছর বয়স্ক শচীন টেন্ডুলকার ১৮ বলে ৫৩ রানের এক অতিমানবীয় ইনিংস খেলেন। আবদুল কাদিরের একটা ওভার ছিল- ৬,০,৪,৬,৬,৬, মোট ২৮ রানের, শচীন বিশ্বে তার আগমনী বার্তা ঘোষণা করল।

আবদুল কাদির : খেলাটা হচ্ছিলো অনেকটা উৎসবের আমেজে। কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্তর কাছ থেকে একটা মেডেন ওভার আদায় করে নিয়ে পরের ওভারে শচীনকে বল করতে যাই। নন স্ট্রাইকিং-এ তাকে বলেছিলাম, আমাকে যেন আবদুল কাদির মনে না করে তার গলি বা স্কুলের কোনো বোলার মনে করে খেলে। তখন সে নিতান্তই বালক, আর কথাটা তাকে অনেক আত্মবিশ্বাস জোগাবে। সে আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলো, কিছুই বলেনি। পরের ওভারে বল করতে এলে প্রথম বলেই ডাউন দ্য উইকেটে এসে ছয় মারল। ওভারের শেষ তিন বলে আরও তিনটা। আমি তাকে আউট করার চেষ্টা করছিলাম। সে এতই প্রতিভাবান ছিল যে আমাকে কোনো সুযোগই দেয়নি।

শচীন টেন্ডুলকার : যখন ব্যাটিংয়ে আসি তখন ৫ ওভারে রান ৬৯। মুশতাক আহমেদকে ২টা ছয় মারলে কাদির আমাকে বলেন, 'বাচ্চাদের মারছো কেন? আমাকে মেরে দেখাও'। এটাই আমাকে উত্তপ্ত করে তোলে। আমি চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করি এবং মেরে দেখাই। অবশ্য ৪ রানের জন্য ম্যাচটা আমরা হেরে গিয়েছিলাম।

কিন্তু সে আউট হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভারতকে চেপে ধরি। আমাদের জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শচীনের আউট থেকে প্রেরণা নিয়ে আমরাই জিতি শেষ পর্যন্ত। (মঈন প্রথম ইনিংসে ৬০ রান করেছিলেন)

শ চী নে র বা জি মা ত

আরেকবার শচীন ঝড়। বিশ্বকাপ, সেঞ্চুরিয়ান, ২০০৩ : পাক-ভারত ম্যাচ মানেই অসাধারণ কিছু। সেখানে বিশ্বকাপ আরও বড় উপলক্ষ। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান করে ২৭৩। শচীন নেমেই শোয়েবের ওভারে ১টা ছয় আর ২টা চার মেরে বুঝিয়ে দেন আজ তিনি কি করবেন। তিনি ৯৮ রান করেন। ততক্ষণে ভারতের জয় নিশ্চিত।

শচীন টেন্ডুলকার : আমাদের গেমপ্ল্যান ছিলো উইকেট না হারানো। পরে হিট করার মতো অনেক ব্যাটসম্যান আছে। তাদের জন্য মঞ্চটা প্রস্তুত রাখা। হঠাৎ করেই সব ঘটে। শোয়েব দুটো লুজ বল দিলো। তারপর বল করছিলো খাটো লেন্থে ও অফস্টিকের বেশ বাইরে। তাকে টার্গেট করার কোনো ব্যাপারই ছিল না। লুজ বল পেয়ে মেরেই যাচ্ছিলাম। তখন আমি ভাবলাম এভাবেই খেলি। ক্রিকেট এমন খেলা যেখানে প্ল্যান বদলানোর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা ছিলো সেই রকমই একটা দিন।